প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তিন টাকা

রাস পূর্ণিমা, ১৩৫৯

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ, কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

যেখানে

নব্য ভারতের

প্রথম ও প্রধান মুক্তি সাধক

প্রফুল্ল চাকী

বাহিরের অসাম্য পরাধীনতা

এবং

অমৈত্রীর বন্ধন হইতে

মুক্তি লাভের জন্য

মৃত্যুর গান গাহিয়া

অমৃতের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন

সেই মাতৃভূমি ভারতবর্ষের যত যত

দেশভক্ত

যাঁহারা আজ জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া

পরলোকগত হইয়াছেন,

যাঁহারা যেখানে বাস করিয়া ধন্য হইতেছেন,

অনাগত কালে যাঁহারা যেখানে আসিয়া

মুক্তি সাধকের সাধনাকে অগ্রসর করিয়া দিবেন

তাঁহাদের সকলের হাতে আমার এই গ্রন্থ

সাদরে

সমর্পণ করিলাম।

ত্যাগিশ্রেষ্ঠ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের

মহীয়সী সহধর্মিণী

মাতা বাসন্তী দেবীর

আশীর্বচন

ভারতের নবযুগের উষা যে-কয়জন তরুণ বীরের তপ্ত রক্তে রঞ্জিত হইয়া দেখা দিয়াছিল প্রফুল্ল তাঁহাদের অন্যতম। মৃত্যু ভেদ করিয়া এই বীরেরা স্বাধীনতার অমৃতের সন্ধান করিয়াছিলেন। মরিয়াও তাঁহারা অমর। আজ যেন শ্রদ্ধায় আমরা তাঁহাদের স্মরণ করি। তাঁহারা আমাদের কাছে কিছুই কামনা করেন নাই; আমরা যেন পূর্ণ জীবন লাভ করি এই জন্যই তাঁহারা জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন। প্রফুল্লর সেই ত্যাগী উজ্জ্বল অমূল্য জীবনের স্বপ্ন-দিনগুলির চিত্র লেখক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত দেশবাসীর হাতে সমর্পণ করিতেছেন। জীবনের সায়াহ্নে আমি মাতৃজাতির পক্ষ হইতে লেখকের কল্যাণ কামনা করিতেছি, আর ভাবিতেছি—

"রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?"

পাটনা,
২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫১

বাসন্তী দেবী

ভূমিকা

সাধারণ মানুষ চক্ষের-সম্মুখে যাহা দেখে তাহাই মনে করিয়া রাখে। যাহা একদা ছিল এখন নাই তাহা ভুলিতে তাহার বিলম্ব হয়না—তাহা সে যত বড়ই হউক না কেন। হয়ত একদা সেটুকু নহিলে আজিকার এতখানির আবির্ভাব সম্ভবই হইত না—তথাপি এই সাধারণ নিয়মের বড় একটা ব্যতিক্রম হয় না। যদি কোন মানুষে তাহা না ভুলে তাহাকে একটু অসাধারণ বলিতেই হইবে। ভুলিয়া যাওয়াই যেখানে সাধারণ এই না ভুলাটুকুই সেখানে অসাধারণ। সে হিসাবে এই পুস্তকখানি এবং ইহার লেখক উভয়েরই যৎকিঞ্চিৎ অসাধারণত্বে অধিকার বর্তমান।

একদা দারুণ দুর্যোগ মাথায় করিয়া যে দুটি পথিক স্বেচ্ছায় গৃহের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর পথে শুধু দেশের কথা মনে করিয়াই বাহির হইয়াছিল। যাহাদের ত্যাগের কথা একদিন বাংলার গৃহে গৃহে বালক বালিকার কাছে রূপকথার মতই, তরুণ তরুণীর কাছে প্রেমের কাহিনীর ন্যায় এবং পরপারের যাত্রী যাত্রিণীর কাছে পবিত্র ভগবৎ নামের তুল্য সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে আজ তাহাদের কথা অধিকাংশ নরনারীই ভুলিতে বসিয়াছে। বিশ্বপ্রেম ও অহিংসার মাপকাঠিতে মাপিতে গিয়া কত স্থানে ও কত জনে সেই গৃহহারা বিরাট ত্যাগী বালক দুটিকে আজ দূর পথ হইতে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ করিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু সেদিন দুটিতে যেমন ঘোর ঝড় ঝঞ্ঝায় অপ্রতিহত গতি হইয়া শুধু কৃষ্ণ আকাশের বুক চিরিয়া যে বিদ্যুতের আলো বাহির হইয়াছিল সেই ক্ষণপ্রভ আলোক-টুকুতে দুঃসাহসের পথ দেখিয়া চলিয়াছিল—আজিও তাহারা তেমনি নিঃশব্দে শুধু সম্মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ইতিহাসের সুদীর্ঘ চিরঞ্জীব পথ

এ জীবনের উপর অল্প অধিকার নাই। তাই এইরূপ জীবন গৃহের গণ্ডী ছাড়াইয়া সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। লেখক দেশের লোককে তাঁহার পিতৃব্য ও পিতৃব্যের দুর্গম-পথের অবিচ্ছেদ্য সাথীর জীবনের ছবি দুখানি সত্য ও নিষ্ঠার তুলিতে বহু আয়াস সহকারে অঙ্কিত করিয়া উপহার দিয়া সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আমাকে এই কথা কয়টি বলিতে দিয়া তিনি আমাকে অসামান্য মর্যাদা দান করিয়াছেন।

কদমকুঁয়া, পাটনা
১লা বৈশাখ, ১৩৫৮

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

প্রথম অধ্যায়

জাতীয়তা'র জন্ম

প্রাণধর্ম্মের স্বাভাবিক গতি—আত্মরক্ষা। এই আত্মরক্ষা যেমন করিয়াই হউক করণীয়। যে সবল সে আক্রমণ দ্বারা অপরকে নিহত করিয়া বাঁচিবে; যে দুর্বল সে প্রবঞ্চনা বা পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিবে। অনশনে থাকিয়া হউক, অর্দ্ধাশনে থাকিয়া হউক মানুষ প্রাণরক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট—উহাই প্রাণৈষণা (struggle instinct)। এই প্রাণৈষণার পরে মানুষ পুষ্টির সন্ধান করিয়া থাকে। পুষ্টি দিয়া অন্ন দিয়া মানুষ প্রাণ ও দেহকে পুষ্ট করে—ইহাই অন্নৈষণা (nutrition instinct)। ইহার পরেই আসে যৌন এষণা sexual instinct) যাহাকে উপনিষদের ভাষায় পুত্র-এষণা বলে। ইহাই সন্তান সন্ততি দ্বারা আপনাকে বিস্তৃত ও প্রসারিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিবার প্রয়াস। ইহারই ভিতর দিয়া সন্তানের প্রতি বা সংস্পর্শে আগতদের প্রতি মমতা বোধ বা মাতৃ-এষণার উদ্ভব হয়। উপনিষদের মতে এই অন্নৈষণা প্রাণৈষণার অন্তর্গত এবং পরলোক এষণা কিংবা আধ্যাত্মিক বা আত্মিক উৎকর্ষের আবেগ এই মাতৃ-এষণার সহিত সম্বদ্ধ।

দিন ধরিয়া জাগে নাই। একটি সমষ্টির লোকের মধ্যে এমন কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ আছে যাহার ফলে তাহারা একত্র সংঘবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে; ক্রমে তাহাদের এই গুণ-গুলির সম্যক প্রকাশের জন্য তাহার একটি পৃথক ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করে। এইরূপে রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

একটি দল বা সমষ্টির মধ্যে বর্তমান এই যে একপ্রকারের বিশিষ্ট গুণ—ইহার উৎপত্তি নানা কারণে হইতে পারে। দীর্ঘকাল ধরিয়া একস্থানে বাস করিলে এই একজাতীয় বিশিষ্ট মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইতে পারে। এক ধর্মাবলম্বী হইলেও ইহার উদ্ভব হইয়া থাকে। একই প্রবংশ হইতে যদি এক সমষ্টির লোক উদ্ভূত হয়, তাহা হইলেও এই মনোভাব জন্মিতে পারে। এই অনুভূতি সর্বাপেক্ষা প্রবল হয় যদি একদল লোক একই অবস্থায় কোন এক রাজা বা শাসনকর্তার অধীনে সুখ-দুঃখ ও আশা-নিরাশার মধ্যে জীবন যাপন করিতে থাকে। এই অবস্থায় নিজেদের অদৃষ্ট সম্বন্ধে যে একটি একতার সৃষ্টি হয় তাহার বন্ধন খুবই দৃঢ় হয়।

এই যে একত্ববোধ ইহা পাঁচশত বৎসর আগেও কোন সমষ্টি বা জাতির মধ্যে দেখা যায় নাই। গ্রীক ও রোম সাম্রাজ্য খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্বে। কিন্তু তখন এই বিচিত্র একত্ব-বোধ ছিল না। আমাদের দেশেও চন্দ্রগুপ্ত বা অশোকের সময়ে এই জাতীয়তা বোধের অস্তিত্ব ছিল না। ইয়োরোপে মধ্য যুগ পর্যন্ত ধর্মযাজকদের প্রভাবই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল।

বিভিন্ন জাতির জনসাধারণ ইহাতে একটুও উদ্বুদ্ধ হইল না। কয়েকজন রাজা নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া এই সুযোগে তাহার একটু সদ্ব্যবহার করিলেন মাত্র। জাতীয়তার ভিত্তি লোকের একত্ববোধ তখন পর্যন্ত জাগিল না।

লোকের চেতনা হইল ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে এবং তাহারা উঠিয়া বসিল বিপ্লবের পরে। রাজার যথেচ্ছাচারে এবং শাসনযন্ত্রের অত্যাচারে সারা ফরাসী দেশ ক্ষেপিয়া উঠিল —বিপ্লবের ধ্বজা উড়িল। ফরাসী দেশের জনসাধারণ দেখিল—একত্র হইয়া তাহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে। এবার তাহারা "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা"—এই বাণী প্রচার করিয়া সমগ্র ইয়োরোপকে তাহাদের পতাকার তলে সমবেত হইতে আহ্বান করিল।

যতক্ষণ পর্যন্ত ফরাসী দেশের লোকেরা তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত ছিল, ততক্ষণ সমস্ত ইয়োরোপ তাহাদের প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ইয়োরোপের জনসাধারণকেও চঞ্চল ও আপনাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারাও তাহাদের দেশের শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন করিতে উদ্যোগী হইতেছিল। এমন সময়ে ফরাসী দেশে বিশ্ববিশ্রুত নেপোলিয়ান বোনাপার্টের আবির্ভাব হইল। তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার সম্মুখে বিপ্লবের সমস্ত ঢেউ থামিয়া গেল। অসামান্য বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে তিনি ধীরে ধীরে সমগ্র ফরাসী দেশের অধিনায়ক হইয়া

উঠিলেন। কিন্তু মাত্র ফরাসী দেশের অধিনায়কত্ব তাঁহাকে তৃপ্ত রাখিতে পারিল না। তাঁহার আশা ছিল বিপুল, আকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিমিত। ধীরে ধীরে তিনি রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুদক্ষ সেনাবাহিনীর সম্মুখে সমস্ত ইয়োরোপ মাথা নত করিল।

ইতিমধ্যে ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রে ইয়োরোপের জনসাধারণ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। নেপোলিয়ান ইয়োরোপের রাজাদের পদানত করিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণকে পারিলেন না। তাহারা দেখিল—নেপোলিয়ন সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার পুরোহিত নহেন, তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়াসী। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের বুভুক্ষার সম্মুখে অন্য দেশ বা জাতির স্বাধীনতাকে বলি দিতে তাঁহার এতটুকুও কুণ্ঠা নাই।

প্রত্যেক দেশের নরনারীর একত্ববোধ প্রবল হইয়া উঠিল। একযোগে ইয়োরোপের জনসাধারণ তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে নেপোলিয়ানের বিশাল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া গেল। জাতীয়তার প্রচণ্ড শক্তির সম্মুখে আপনার পরাজয় স্বীকার করিয়া নেপোলিয়ান সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে চির কারাবাস মানিয়া লইলেন।

ইহার পর হইতেই জাতীয়তার প্রধান স্বরূপ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ইয়োরোপের সমস্ত জাতি তাহাদের এই একত্ববোধকে দৃঢ়ীভূত করিতে উঠিয়া

কাম্য। সাম্য, মৈত্রী, এবং স্বাধীনতার বাণী তখন সে উদাত্ত কণ্ঠে সর্বত্র প্রচার করিতে থাকে।

আজকাল পৃথিবীতে অতি অল্প লোকই আছে যাহারা সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার নাম শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন স্বাধীনতার লীলাভূমি ইয়োরোপেও বড় বড় মনীষীরা মানুষের এই অধিকারের দাবীতে বিচলিত হইয়া উঠিতেন—তাঁহারা ইহারই মধ্যে দেখিতেন রাষ্ট্রের বিনাশের সূচনায় প্রলয়ের আগমনী। এই বিচলিত হওয়াটা যে একেবারেই অহেতুক ছিল তাহাও বলা যায় না; কারণ মানুষের এই তিনটি অধিকারের দাবী সকলের আগে স্পষ্টভাবে করা হইয়াছিল একটি বিপ্লবের প্রারম্ভে যাহা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজ্যকে কেন্দ্র করিয়া দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের বিপ্লবী-রাই সর্বপ্রথমে উচ্চ নির্ভীক কণ্ঠে "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার" দাবী করেন এবং ইহার বাণী সারা পৃথিবীতে প্রচারিত করেন।

অথচ এই বিপ্লবের আগে ফরাসী দেশে সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার নাম মাত্র ছিল না বলিলেও চলে। সমাজ ছিল বহুধা বিভক্ত এবং বড় বড় লর্ড মার্কুইস্‌রাই সমাজের ষোল আনা সুখ সুবিধা উপভোগ করিত—নিম্নস্তরের যাহারা তাহারা কোন প্রকারে দিনপাত করিত মাত্র। বংশ মর্যাদা বা ধনগৌরবে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদিগকে কোন প্রকার কর বা

রাজস্ব দিতে হইত না। রাষ্ট্রের প্রায় সকল অর্থই আসিত নিম্নস্তরের লোকেদের নিকট হইতে। মৈত্রীর চিহ্নমাত্র ফরাসী দেশে ছিল না। সারা দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত ছিল—এক অংশের সহিত অপর অংশের সংযোগ এবং সম্বন্ধ ছিল অতি ক্ষীণ। এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে যাইতে হইলে প্রায় পঞ্চাশ প্রকারের বাধা অতিক্রম করিতে হইত। ইহার ফলে ফরাসীরা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল যে তাহারা একই জাতি এবং তাহাদের সুখ দুঃখ পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত। সাম্য এবং মৈত্রীর যেখানে এতখানি অভাব সেখানে যে স্বাধীনতা ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। রাজা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী—তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিবার শক্তি ছিল না কাহারও। পার্লামেণ্ট একটা ছিল—তাহা নামে মাত্র। এক শত বৎসরেরও বেশী হইয়াছিল, তবুও রাজা একটিবারের জন্যও তাহা আহ্বান করেন নাই। এই States General নামক পার্লামেণ্টে জনসাধারণের কোন প্রতিনিধি ছিল না। তবু সেখানে জমিদার ও লর্ডরা আসিয়া রাজার যথেচ্ছ শাসনের অন্তরায় হইতে পারে—এই সম্ভাবনাটুকু মাত্র ছিল। ফল এই হইয়াছিল যে রাজার প্রিয় কয়েকজন অনুচরের হাতে শাসন বিভাগের সমস্ত কার্যের ভার ন্যস্ত থাকিত। তাহারা নানাভাবে দেশের লোকের উপরে অত্যাচার করিত; কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায়ই ছিল না। কারণে অকারণে কারাবরণ করা ফরাসী দেশের সাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রতিবাদ

হইয়া মাটিতে লুটাইয়াছিল; সর্বদেশে সর্বকালে ইহা এই-ভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে।

ষোড়শ লুই (Louis XVI) তখন ফরাসী দেশের সিংহাসনে। শতবর্ষব্যাপী অত্যাচার ও অসাম্যের বোঝায় দেশের লোক তখন প্রপীড়িত। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশের মধ্যেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বাণী লইয়া কয়েকজন লেখক ও মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাঁহাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াই ফরাসী দেশের জনসাধারণ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়াছিল।

এই দুই মনীষীর নাম যথাক্রমে মণ্টেস্কু (Montesquieu) ও রুশো (Rousseau)। মণ্টেস্কু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (আনুমানিক ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে) একবার ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। ফরাসী রাজ্যের একই অধিনায়কের করতলগত স্বেচ্ছাচারিতার পাশে ইংলণ্ডের সংযমশীলতা এবং ক্ষমতা বিভাগ (Separation of powers) তাঁহার কাছে এমন অভূতপূর্ব বলিয়া বোধ হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত Spirit of the laws (Esprit des Lois) গ্রন্থে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিকেই সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ও সুন্দর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। মানুষের সাম্য ও স্বাধীনতা রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় তখনই যখন একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা নিবদ্ধ থাকে না। ইহাই ছিল তাঁহার মূল নীতি।

সেই স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হইল; কারণ সে দেখিল রাষ্ট্রের অভাবে তাহার অনেকখানিই অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। কিন্তু তথাপি সে রাষ্ট্রের কাছে নিজের জন্মগত স্বাতন্ত্র্য বলি দিতে রাজী হইল না। সে বলিল—আমরা নিজেরাই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিব—রাষ্ট্রের শক্তি হইবে আমাদের সম্মিলিত শক্তির প্রতিভূ এবং প্রতীক। এই ভাবে যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল তাহাতে মানুষের জন্মগত স্বাধীনতা এবং সাম্য পূর্ণ মাত্রায় বজায় রহিল অথচ রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া তাহার নিজের বিশিষ্ট বৃত্তিগুলি বিকাশের পথও রুদ্ধ হইল না।

রুশোর এই আদর্শবাদের ছত্রে ছত্রে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি শ্রদ্ধার যে ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অত্যাচার-প্রপীড়িত জনসাধারণের বেদনা-বিদ্ধ ক্ষতস্থানে যেন ব্যথাহরণ প্রলেপ লাগাইয়া দিয়াছিল, তাহাদের বঞ্চিত ত্রস্ত অন্তর এক অপূর্ব শক্তিতে পূর্ণ করিয়াছিল।

মানুষ ক্ষুদ্র ছায়াতরু রোপণ করিয়া লোকান্তরে চলিয়া যায়। কালে সেই তরু তাহার দীর্ঘ-পত্রবহুল শাখা প্রশাখা চারিদিকে প্রসারিত করিয়া শীতাতপ, রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে বাঁচাইয়া স্নিগ্ধ ও বিশাল ছায়া রচনা করিয়া রাখে। কত পান্থ, কত দূরাগত সেখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে ভাবে কোন্ সে ভাগ্যবান্ যিনি এই স্নিগ্ধ মনোরম ছায়াগৃহ রচনা করিয়া গিয়াছেন; কত বালক যুবা গ্রাম্য ক্রীড়ামোদে সেই সুশীতল ও মনোরম বৃক্ষতল রঙ্গমঞ্চের মতই সুখদ ও আনন্দপ্রদ করিয়া

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের পটভূমিকা

১৭৫৭ সালে বাংলাদেশে বৃটিশের হাতে প্রথম পরাজয়ের পর হইতে ভারতের জনগণ একশত বৎসর ধরিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে নানাস্থানে প্রচণ্ড সংগ্রাম করিয়াছে। খণ্ড কাব্যের মত সেই সময়কার ইতিহাস অতুলনীয় বীরত্ব ও অসামান্য আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। সিরাজদ্দৌলা, মোহনলাল, হায়দার আলি, টিপু সুলতান, ভেলুতাপ্‌পি, আপ্‌পা সাহেব ভোঁসলা, পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগম, সর্দ্দার শ্যামসিং, আতিরিওয়ালা, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া টোপি, তুমর্রাওনের মহারাজা কুলোয়ার সিং, নানা সাহেব ইত্যাদি বহু বীরের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। প্রথমে না বুঝিলেও ভারতের জনগণ পরে আপনাদের ভ্রম ও অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া সম্মিলিত হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালে বাহাদুর সাহের অধিনায়কত্বে তাহারা স্বাধীন জাতি হিসাবে যুদ্ধ করে। যুদ্ধের প্রথম ভাগ কয়েক ক্ষেত্রে জয়লাভ সত্ত্বেও দুর্ভাগ্য এবং ভ্রান্ত নেতৃত্ব—ধীরে ধীরে তাহাদের চরম পরাজয় ও পরাধীনতা আনিয়া দিয়াছিল। তথাপি ঝাঁসির রাণী, তাঁতিয়া টোপি, কুলোয়ার সিং ও নানা সাহেব জাতির গগনে দীপ্ত নক্ষত্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন।

সময়োপযোগী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই সমাজ জীবনে পুঞ্জীভূত অহিতাচার দূর করিবার চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিও তাঁহার মমতার অভাব ছিল না। জনসাধারণের স্বত্ব-স্বাধীনতার যাহাতে সম্প্রসারণ হয় সে দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহার কর্মজীবন এত বিপুল, ব্যাপক ও বহুমুখী হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন বিশেষ করিয়া ধর্মসংস্কারক বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একান্ত ধর্মপ্রাণ কোন সমাজের মধ্যে যখনি কোন নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তখনই তাহাকে ধর্মের মধ্য দিয়াই অগ্রসর করিতে হয়। নতুবা সে আদর্শ সে সমাজের মর্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্যই রাজা রামমোহন নব যুগের সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিলেও তাঁহার কর্মশক্তির প্রভাব সংস্কার কার্যের উপরেই অধিক পড়িয়াছিল।

স্বাধীনতাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। ধর্মের তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে এই দুই দিকেই রাজা বিশেষভাবে এই স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একদিক দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাধনার ও স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে রাজার আদর্শের যোগ ও মিল থাকিলেও, ইহা সর্বতোভাবেই সেই আদর্শ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর ছিল। আর স্বদেশের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে রাজার যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ছিল, তাহাই

বিচারে, কি ধর্মসাধনে একান্তভাবে শাস্ত্রগুরুর অধিকার ও প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করেন নাই। কিয়ৎপরিমাণে মার্টিন লুথারের মত রাজা রামমোহনও শাস্ত্রনির্ধারণে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু পরবর্তী ব্রাহ্ম আচার্যগণের ন্যায় শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও অধিকার একেবারে অস্বীকার করেন নাই। আবার অন্যদিকে লুথারের ন্যায় রাজা শাস্ত্রার্থ নির্ধারণে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র স্বানুভূতির উপরেই শাস্ত্রোপদেশের সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভারও অর্পণ করেন নাই। এইজন্যই প্রোটেস্ট্যাণ্ট খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তে শাস্ত্র ও স্বানুভূতির—Scripture এবং Private judgement-এর মধ্যে যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই, রাজা আপনার সিদ্ধান্তে, শাস্ত্রার্থ বিচারে, সদ্‌গুরুর যথাযোগ্য স্থান ও অধিকার প্রদান করিয়া, অতি সহজেই সেই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। আর এইরূপেই রাজা রামমোহন তত্ত্ব বিচারে ও ধর্মসাধনে ভারতের প্রাচীন এবং য়ুরোপের আধুনিক সাধনার উচ্চতম আদর্শের মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

যেমন তত্ত্ববিচারে ও ধর্মসংস্কারে, সেইরূপ আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তেও রাজা রামমোহন প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক য়ুরোপের সাধনার মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াই আমাদিগের বর্তমান যুগ আদর্শকে সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও একই সঙ্গে স্বাদেশিক ও সার্বজনীন করিয়া

হিন্দুসাধনার সমাজতত্ত্বের বিশেষত্ব। কিন্তু কালক্রমে এই বর্ণাশ্রম ধর্মও যখন সামাজিক উন্নতি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহায় না হইয়া তাহার অন্তরায়ই হইয়া উঠিতে লাগিল, যখন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-স্বভাব-সুলভ সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রপ্রকৃতি-সুলভ রজোগুণ হারাইয়াও কেবল জন্মের দোহাই দিয়াই ব্রাহ্মণত্বের বা ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকার ও মর্যাদা দাবী করিতে লাগিলেন, তখন সমাজের ও ব্যক্তির উভয়ের কল্যাণার্থে প্রাচীন কুলধর্মকে অতিক্রম করাই আবশ্যক হইয়া উঠিল। এই জন্যই গীতায় ভগবান প্রথমে বর্ণাশ্রমের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াও শেষে, গুহ্যাদপি গুহ্যতম যে ধর্মতত্ত্ব তাহার অভিব্যক্তি করিয়া বলিলেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

অতএব বর্ণাশ্রম প্রধান হিন্দুর সমাজতত্ত্বেও সর্বকর্ম-ন্যাসপূর্বক, মহাজনপন্থা অবলম্বন করিয়া, এই বর্ণাশ্রমের অধিকার অতিক্রম করিবারও প্রশস্তপথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর ইহাই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর সমাজতত্ত্বের ও সমাজনীতির শেষ শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত। রাজা এই সিদ্ধান্তের উপরেই আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম সামাজিক সিদ্ধান্তের সঙ্গতি সাধন করিয়াছিলেন। কর্মসাধনই সামাজিক জীবনের উপজীব্য। কর্মের ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে লাভ করাই

প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হ'ন, কোথাও তাঁহাদের এই মহাজন প্রতিভাসুলভ সম্যক্‌দর্শন থাকে না। থাকিলে, তাঁহারা যে বিশেষ কার্যে ব্রতী হ'ন সেই কার্যের সফলতারই ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেন। ফলতঃ প্রাকৃতজনের মধ্যে সম্যক্‌ দর্শন সচরাচর সংস্কার কার্যের গতিবেগকে একান্ত-ভাবে কমাইয়া দিয়া তাহাদিগের কর্মোদ্যমকে বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্যই সংস্কারের পক্ষে কর্মোৎসাহের যতটা প্রয়োজন সম্যক দৃষ্টির ততটা প্রয়োজন নাই। একদেশ-দর্শিতা বেগবতী সংস্কার চেষ্টার জন্য একান্তই আবশ্যক। অতএব রাজা যে সমুন্নত যুগ আদর্শ প্রকাশিত করেন, সেই আদর্শের যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া সমাজক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কেশবচন্দ্রের প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত একদেশদর্শিনী সংস্কার-চেষ্টারই একান্ত প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে, রাজার শিক্ষার অনুসরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের স্বদেশী সমাজে প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের মধ্যে যে উদার ও উন্নত সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, তাহারই প্রয়োজনে, কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভা, তাঁর প্রথম বয়সে স্বল্পবিস্তর একদেশদর্শী ধর্ম ও সমাজসংস্কার কার্যে ব্রতী হইয়াছিল। কি ব্যক্তি, কি সমাজ, সকলেরই সত্যলাভের জন্য প্রথমে সর্ববিধ পূর্বসংস্কার বর্জিত হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্রের প্রামাণ্য, সদ্‌গুরুর মর্যাদা, সমাজ বিধানের ধর্মপ্রাণতা, এসকলকে স্বল্পবিস্তর অস্বীকার না করিলে,

মানসক্ষেত্র কদাপি সম্পূর্ণ সংস্কার বর্জিত ও নির্মল হইতে পারে না। এই সর্বগ্রাসী সন্দেহ ও অসত্যবোধ হইতেই ক্রমে খাঁটি ও সরল বিশ্বাস এবং সত্য আস্তিকবুদ্ধির সঞ্চার হয়। "নেতি" "নেতি" বলিয়াই "ইতিতে" পৌঁছিতে হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে "নেতি" "নেতি" বলিয়া একেবারে পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব শূন্য করিয়াই, পরে ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্বং খল্বিদংব্রহ্ম—এই মহাসত্যে উপনীত হইতে হয়। কেশবচন্দ্রের সমাজ ও ধর্মসংস্কার চেষ্টা রাজার আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া, প্রথমে এই "নেতির" পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল। এ পথ সংগ্রামের পথ, সন্ধির পথ নহে। এ পথ শক্তির পথ সংযমের পথ নহে। ইহা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ, আত্মবিলোপের পথ নহে। এ পথ ইংরেজিতে যাহাকে Indopendence বা অনধীনতা বলে তারই পথ। সত্য-স্বাধীনতার পথ নহে। এ পথে যাইয়া এক প্রকারের ফ্রিডমে (Freedom) পৌঁছান যায়, কিন্তু উপনিষদ যাহাকে স্বারাজ্য বলিয়াছেন সে বস্তু লাভ হয় না। এ পথ Rights-এর পথ, স্বত্বের পথ ; Reconciliation-এর পথ বা সামঞ্জস্য ও শান্তির পথ নহে। কেশবচন্দ্র প্রথম বয়সে, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার ব্রতে ব্রতী হইয়া, এই স্বত্বের পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। শাস্ত্রের প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা, গুরুর প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তির স্বত্ব প্রতিষ্ঠা,—ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের

করিতেন। সময় সময় রাজপুরুষগণ নিজেরাই উপযাচক হইয়া বিশেষ বিশেষ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে চাহিতেন। ঐ সময়েরই কাছাকাছি কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল সেকালের বাংলার মনীষিগণ সকলেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনভুক্ত ছিলেন। সেকালে ইঁহারাই আপনাদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থাদির আলোচনা করিতেন এবং সময়ে সময়ে দেশের অভাব অভিযোগের কথা রাজপুরুষদিগের গোচরে প্রেরণ করিতেন। রাজপুরুষেরাও ইঁহাদিগকে জনমণ্ডলীর স্বাভাবিক অধিনায়ক বা Natural Leaders বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইঁহাদিগের মতামতের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন করিতেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা সবদা জমিদারদেরই সভা ছিল। বাংলার, বিশেষত কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থানের জমিদারগণের স্বত্ব-স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই সভার জন্ম হয়। ইহার সভ্য এবং অধিনায়ক সকলেই জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল জমীদার ছিলেন না বটে, কিন্তু জমিদারী স্বত্ব-স্বার্থের পরিপোষক এবং জমিদার সমাজের মুখ-পাত্ররূপেই তিনি দেশের তদানিন্তন রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা জমিদারদিগের সভা হইলেও প্রয়োজন মত আপনাদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী

অস্বীকার করা যায় না। য়ুরোপীয় সমাজের তুলনায় আমাদের নিজেদের সমাজ-জীবন অতিশয় হীন, এবং য়ুরোপের যুক্তিবাদের তৌলদণ্ডে আমাদিগের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মসাধনা অত্যন্ত ভ্রান্ত ও কুসংস্কার পূর্ণ বলিয়াই বোধ হইত। আর হীনতা বোধ সর্বদাই আমাদিগের স্বদেশাভিমানে অত্যন্ত আঘাত করিত। এই বেদনার উত্তেজনাতেই আমরা তখন এতটা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া আমাদের ধর্মের ও সমাজের সংস্কার সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আমাদের এই সংস্কার চেষ্টা যদি সর্বতোভাবে খৃষ্টীয়ানীপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিত তাহা হইলে সেই চেষ্টার ফলে আমাদিগের মধ্যে কোন প্রকারের সত্য স্বাদেশিকতা ফুটিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু যে ব্যক্তিস্বাভিমান বা Individualism এবং যুক্তিবাদ বা Rationalism আমাদিগকে নিজেদের সমাজের ও ধর্মের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করিতে প্রণোদিত করে, তাহারই প্রভাবে আমাদিগের পক্ষে খৃষ্ট-ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন এবং য়ুরোপীয় সমাজবিধানের বশ্যতা-গ্রহণও একান্তই অসাধ্য করিয়া তুলে। স্বদেশের বেদপুরাণাদিকে মনুষ্য প্রতিভা রচিত এবং সাধারণ মানব-বুদ্ধি-সহজ ভ্রম-কল্পনা-প্রসূত বলিয়া, প্রামাণ্য-মর্যাদা নষ্ট করিয়া খৃষ্টীয়ানের বাইবেলকে ঈশ্বর প্রণীত ও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার আর কোন পথ রহিল না। শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব উড়াইয়া দিয়া যীশু খৃষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাস করা অসাধ্য হইল। অথচ এইরূপ অবস্থাতেও যখন খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম প্রচারকেরা হিন্দু-

প্রতিবাদিগণের সমক্ষে এই ধর্মেরই সনাতন-তত্ত্ব ও চিরন্তন আদর্শের অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপন্ন করেন। আপনা-দিগের পুরাতন ধর্মের যে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এইভাবে আমাদিগের মধ্যে ক্রমে জাগিয়া উঠে তাহারই উপরে সর্বপ্রথমে আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Nationalism-এর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বহুবিধ মানসিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে নবোদিত স্বাদেশিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে ইংরেজি শিক্ষার অনুপ্রাণনে এই নূতন স্বাদেশিকতার উৎপত্তি হয় সেই শিক্ষারই বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, একদিকে দেশের নব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং অন্যদিকে ইংরেজ রাজপুরুষ ও ব্যবসায়িগণের মধ্যে নানা বিষয়ে একটা প্রবল প্রতিযোগিতা জন্মিতে আরম্ভ করে। এই প্রতিযোগিতা নিবন্ধন একদিকে এক অভিনব স্বদেশপ্রীতি এবং অন্যদিকে একটা বিজাতীয় পরজাতি বিদ্বেষও জাগিয়া উঠে। তদানিন্তন বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই নূতন স্বজাতি-বাৎসল্য ও পরজাতি-বিদ্বেষ দুই-ই মুখরিত হইয়া উঠে। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন"-এর প্রতিষ্ঠা করেন। নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে বঙ্গদর্শন স্বদেশের প্রাচীন গৌরব-স্মৃতি জাগাইয়া, এই নবজাত স্বদেশ প্রীতিকে বাড়াইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোবিন্দ্র চন্দ্র, রঙ্গলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনোমোহন প্রভৃতির কবি-প্রতিভা নানা দিকে ও নানাভাবে এই স্বদেশা-

বলিয়াই, তাঁহার কর্মজীবন এমন অনন্যসাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছে।

কোনো দেশে যখনি কোনো নূতন ভাব ও আদর্শ ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন সর্বাদৌ তাহা উদারমতি, বিষয়বুদ্ধিহীন উদ্যমশীল যুবক মণ্ডলীর চিত্তকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদিগের দেশের এই নবজাত স্বদেশ-প্রেমও সর্বপ্রথমে শিক্ষার্থী যুবকগণের চিত্তকে অধিকার করে এবং তাহাদের যৌবনস্বভাবসুলভ কল্পনা ও ভাবুকতাকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িয়া উঠে। আর এই জন্য এই অভিনব স্বাদেশিকতা প্রথমেই কোন প্রকারের বস্তুতন্ত্রতাও লাভ করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগী সাহিত্যিকগণ বঙ্গদর্শনের সাহায্যে দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বজাতির প্রাচীন গৌরবস্মৃতি জাগাইয়া কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের নূতন স্বাদেশিকতাকে একটা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন সত্য। কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সাহিত্যের এবং সাধারণ সভ্যতার ও সাধনার লুপ্ত গৌরবের উদ্ধারে যে পরিমাণে মনোনিবেশ করিয়াছিল, তাহার পূর্বতন রাষ্ট্রীয় জীবনের আলোচনায় সে পরিমাণে মনোনিবেশ করে নাই। বিশেষত দেশের আধুনিক রাষ্ট্রীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিচার আলোচনা কখনই প্রকাশ্য ভাবে বঙ্গদর্শনে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। "কমলাকান্তের দপ্তর"-এ লেখকের অসাধারণ শ্লেষালঙ্কারে আচ্ছাদিত হইয়া আধুনিক ভারতের অনেক রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও

সম্প্রদায়ের চিত্তকে অধিকার করিয়া তাঁহার অনন্যপ্রতিযোগী ঐতিহাসিক প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কলিকাতার এই ছাত্রসভাতেই তাহা সর্ব প্রথমে স্ফুরিত হয়। এই ছাত্র-সভায় সুরেন্দ্রনাথ "শিখ শক্তির অভ্যুদয়—The Rise of the Sikh Power"—সম্বন্ধে যে অগ্নিময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার স্মৃতি,—সেই বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের চিত্ত হইতে কখনই লুপ্ত হইবেনা। শিখ ধর্মের উৎপত্তি, শিখ খালসার প্রতিষ্ঠা, প্রথমে মোগল ও পরে ব্রিটিশ প্রভুশক্তির সঙ্গে শিখ খালসার যুদ্ধ বিগ্রহের কথা, সেকালের স্কুলপাঠ্য ভারত ইতিহাসের মধ্যেও ছিল। সুরেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় যে সকল ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল এমন নহে। কিন্তু সেই সকল পূর্বপরিচিত ঘটনার অন্তরালে স্বরাষ্ট্র-প্রীতির যে শক্তিশালিনী উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল, সুরেন্দ্রনাথের তড়িত-সঞ্চারিণী বাগ্মী-প্রতিভাই সর্বপ্রথমে আমাদের নিকট তাহা ফুটাইয়া তুলে। সেই হইতেই এদেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানস চক্ষে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অভিনব মর্ম ও উন্মাদিনী উদ্দীপনা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। ছত্রপতি মহারাজা শিবাজি আধুনিক ভারতক্ষেত্রে যে এক বিশাল হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহার মর্যাদাজ্ঞান তখনো আমাদের জন্মায় নাই। সুতরাং সে সময়ে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উদ্দীপনা আমাদিগের নবজাগ্রত স্বাদেশিকতাকে স্পর্শ করে নাই। আমাদের এই নূতন

নহে, এই জ্ঞান তখনো খুব পরিপুষ্ট হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের মুখে শিখ ইতিহাসের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষু রাজপুতনার কীর্তি কাহিনীর উপরেও গিয়া পড়িল। এইরূপে সুরেন্দ্রনাথই সর্ব প্রথমে আমাদের নিকটে ভারতের আধুনিক ইতিহাসে এক নূতন প্রাণতার প্রতিষ্ঠা করেন।

যেমন ভারতের ইতিহাস পড়িয়াও আমরা এতাবৎকাল পর্যন্ত তাহা হইতে প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রকারের সত্য স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সেইরূপ য়ুরোপীয় ইতিহাস পড়িয়াও তাহার ভিতরে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা আছে, তাহাও ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মীপ্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক য়ুরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকেও উজ্জ্বল করিয়া ধরে। ম্যাট্‌সিনির দৈবীপ্রতিভা, গ্যারীবল্ডীর স্বদেশ-উদ্ধারকল্পে অদ্ভুত কর্মচেষ্টা, য়ুন ইতালী (Young Italy) সম্প্রদায়ের এবং নব্য আয়র্লণ্ডের (New Ireland) আত্মোৎ-সর্গপূর্ণ দেশচর্যা, এসকলের কথা সুরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে এদেশে প্রচার করেন এবং তাঁহার এই সকল ঐতিহাসিক শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া পূর্বে আমাদের যে স্বদেশাভিমান বহুল পরিমাণে কবি কল্পনা ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই এখন স্বদেশের এবং বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, কিয়ৎ পরিমাণে সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিল।

কার্যকরী, (practical) বাঙ্গালীর বুদ্ধি ভাবময়ী, (idealistic) বলা যায়। কার্যকরী বুদ্ধি ফলসন্ধিৎসু—কর্মাকর্মের আসন্ন ফল লক্ষ্য করিয়া চলে। ভাবময়ী বুদ্ধি সত্যসন্ধিৎসু; কর্মাকর্মের প্রত্যক্ষ ফলাফলকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাবরাজ্যে ও তত্ত্বাঙ্গে তাহার কি পরিণাম ঘটিবে তাহাই কেবল দেখে। কার্যকরী বুদ্ধি আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া বাস্তবকে ধরিতে চাহে। ভাবময়ী বুদ্ধি বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া আদর্শেতেই আত্মসমর্পণ করে। ভাবময়ী বুদ্ধি দেশচর্যা ও দেশভক্তিকে সর্বপ্রকারের প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা হইতে যথাসম্ভব মুক্ত করিয়া উদার ও সার্বজনীন করিতে চাহে। রাষ্ট্রীয় জীবনে কার্যকরী বুদ্ধি আসন্নফলসন্ধিৎসু politician-এর বা রাজনীতিকের সৃষ্টি করে। আর ভাবময়ী বুদ্ধি দূরদর্শী ও সম্যকদর্শী নীতিজ্ঞ statesman-এরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রের ও বাংলার কর্মজীবনের তুলনায় এই দুই জাতীয় মানববুদ্ধির ভেদাভেদের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

আর বাঙ্গালার প্রকৃতির গুণে এবং আধুনিক বাংলার ইতিহাসের কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় গৌরব স্মৃতির অভাবে, আমাদিগের বর্ত্তমান স্বাদেশিকতা যেমন সমগ্র ভারতবর্ষকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সেইরূপ বাঙ্গালী কর্মনায়ক সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় কর্মজীবন ও সমগ্র ভারতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়াই গড়িতে আরম্ভ করে। সুরেন্দ্রনাথের পূর্বে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাষ্ট্রীয় কর্মচেষ্টা প্রাদেশিক শাসনের ভালমন্দ

যদি সহসা এই স্থানটি পূর্ণ করিতে অগ্রসর না হইত, তাহা হইলে আজ সুরেন্দ্রনাথের এই National Conf : আমাদিগের রাষ্ট্রীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম শক্তিকেন্দ্র হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ভারত গভর্ণমেণ্টের অবসর প্রাপ্ত প্রধান সেক্রেটারী অ্যালান হিউম। ইহার পৃষ্ঠপোষক কলিকাতার প্রবীণতম ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বোম্বাইএর প্রবীণতম কৌন্সিলী ফিরোজসা মেহেতা, মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ উকীল সুব্রহ্মণ্য আয়ার। কংগ্রেস এইরূপে প্রথম হইতেই অসাধারণ পদবল ও ধনবলের উপরেই প্রতিষ্ঠালাভ করে। সুরেন্দ্রনাথের কর্মচেষ্টার অন্তরালে তখন এ দু'য়ের কিছুই ছিল না। সুতরাং কংগ্রেস যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত National Conference-কে সহজেই আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল, ইহা কিছুই আশ্চর্য নহে। আর ইহাতে প্রকৃতপক্ষে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষতি হইয়াছে, না লাভ হইয়াছে বলা কঠিন নহে। কংগ্রেস যতটা রাতারাতি বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের কন্‌ফারেন্সের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। অন্যদিকে সুরেন্দ্র নাথের এই কর্মচেষ্টা যদি কংগ্রেসের দ্বারা এইরূপে ব্যাহত না হইত তাহা হইলে দেশে আজ যে প্রভূত শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় জীবন ও লোকমত গড়িয়া উঠিত, কংগ্রেস তাহা যে কেবল গড়িয়া তুলিতে পারে নাই তাহা নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ-ভাবে তাহার ব্যাঘাতই জন্মাইয়াছে। কংগ্রেস দেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ভারতের

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলার শক্তি ও বিপ্লব সাধনার ইতিহাস

লর্ড কার্জন যখন ভারতের শাসনকর্তা তখন তাঁহার কুটিল রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে তিনি বঙ্গভঙ্গের কল্পনায় মাতিয়া উঠিলেন এবং পূর্ববঙ্গে ভ্রমণকালে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথম একটি খসড়া প্রস্তাব সাধারণের বিবেচনা ও সমালোচনার জন্য প্রচার করা হয়। ইহাতে আসাম প্রদেশের আয়তন কিছু বর্ধিত করা হইয়াছিল এবং একদিকে বঙ্গদেশ অপরদিকে মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের সীমান্তেও কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছিল। ইহার ফলে বঙ্গপ্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় এককোটি দশলক্ষ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা ছিল। এই প্রস্তাব অধিকারীদের মনঃপূত না হওয়ায় নাকচ হয় এবং ইহার পরিবর্তে একটি বৃহত্তর প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়—ইহার কারণ স্বরূপ বলা হয় যে এই প্রস্তাব কার্যকরী হইলে বঙ্গপ্রদেশের শাসনকর্তার শাসনভার প্রয়োজনীয়রূপে লঘু হইবে। উপরন্তু ইহা দ্বারা যে অঞ্চল বঙ্গ প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে তাহার অধিবাসীদের আইনসঙ্গত স্বার্থরক্ষাসম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব হইবে।

এই প্রস্তাবে আসাম প্রদেশের সহিত বঙ্গপ্রদেশের

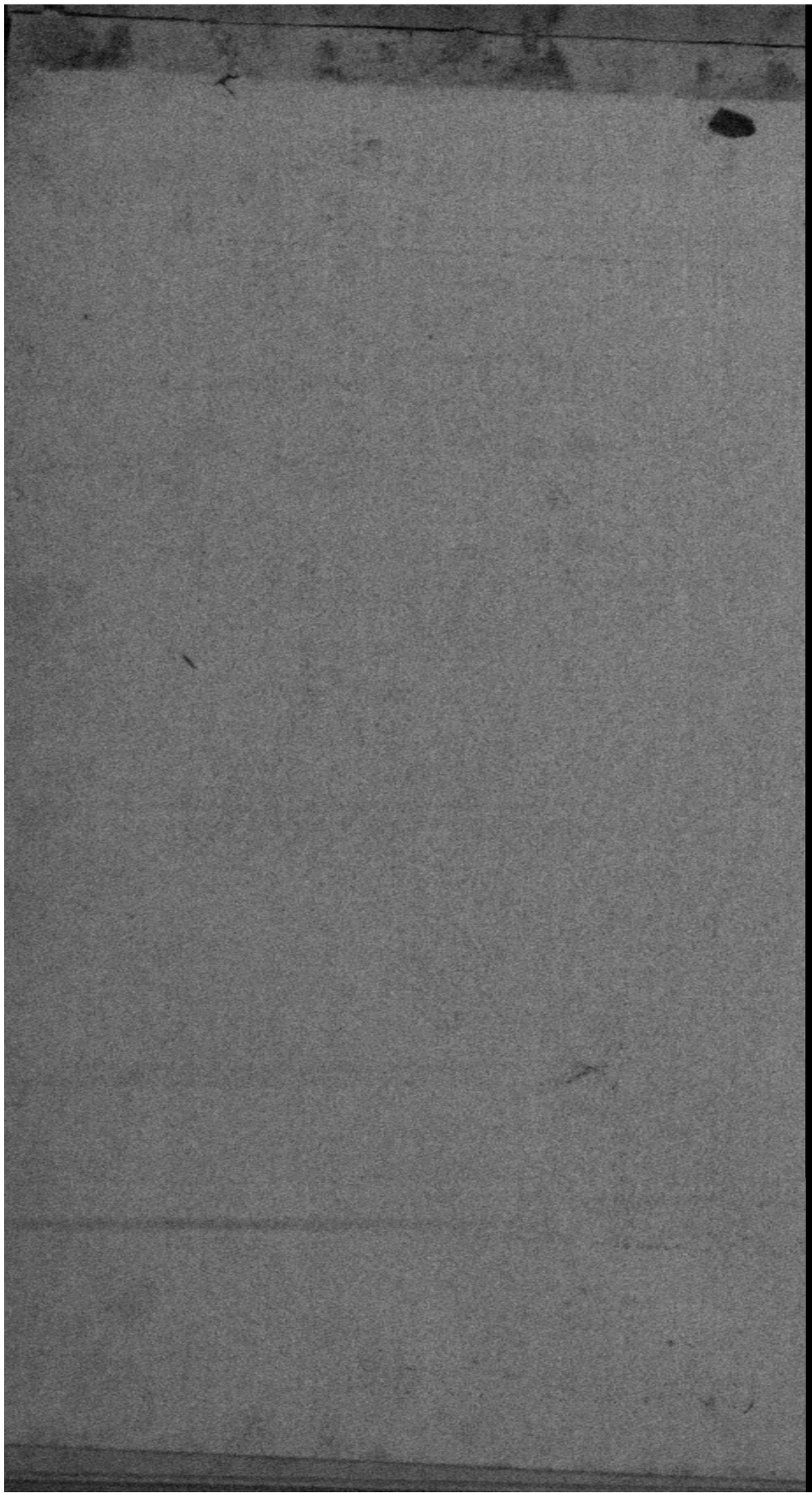

এই প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ায় তখন বাঙালী জাতির সমবেত শক্তিকে নষ্ট করা ও পূর্ববঙ্গে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপন করাই এই বঙ্গচ্ছেদের গূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়া স্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্র প্রকাশ করিলেন।

বঙ্গচ্ছেদের সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইবামাত্রই বাঙালী জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। গভীর মনোবেদনায় চারিদিকেই কূটনীতির প্রতিবাদ হইতে লাগিল। কলিকাতায়, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। সমস্ত দেশের উপর দিয়া কি এক বিষাদের বন্যা বহিতে লাগিল। ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে সংবাদ পাওয়া গেল যে বিলাতে ভারত সচিব বঙ্গচ্ছেদ মঞ্জুর করিয়াছেন। তুমুল আন্দোলনে ও আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হইল না দেখিয়া, বাঙালী আহত সিংহের ন্যায় গর্জিয়া উঠিল। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতিবাদকল্পে কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। বিশ হাজার লোক এই সভায় সমবেত হইলেন—সভাপতি হইলেন কাশীম-বাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ঘরের ভিতর লোক ধরিল না—সভার অংশ মাঠে সরাইয়া লইতে হইল। সঞ্জীবনী পত্রিকায় বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব বাহির হইল—টাউনহলের সেই বিরাট সভায় বিলাতী দ্রব্য বর্জন প্রস্তাব গৃহীত হইল। দেশ গর্জন করিয়া বলিল—বিলাতী দ্রব্য আর স্পর্শ করিব না। যে আন্দোলনে পূর্বে আবেদন-নিবেদনের

পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান !
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান্ !
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান্ !

বিলাতের পার্লামেণ্ট সভায় লর্ড মর্লে প্রকাশ করিলেন "The partition of Bengal is a settled fact"। এই বাণী ভারতে পৌঁছিবামাত্র কলিকাতার জনসভায় দাঁড়াইয়া সুরেন্দ্রনাথের বজ্রকণ্ঠে প্রত্যুত্তর প্রতিধ্বনি তুলিল—

"We will unsettle this settled fact"। এই অগ্নিমন্ত্রে সারা বাংলাদেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বাংলার নগরে গ্রামে লর্ড মর্লের আদেশবাণী শ্রবণ মাত্র ছয় শত বিরাট সভায় বাংলার নরনারী মুক্তকণ্ঠে ইহা ব্যর্থ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। সেদিন কোথাও কোন মতভেদ ছিল না, বাংলার সমস্ত ধনকুবের ও জমিদারগণ একবাক্যে জাতীয় প্রতিবাদে যোগদান করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের মহারাজ সূর্য্যকান্তের মতই পূর্ববঙ্গের জমিদারগণ, উত্তরবঙ্গের

অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে যুবকগণের চেষ্টায় বরিশাল হইতে বিলাতী লবণ নির্বাসিত হইয়াছিল বলিতে পারা যায়। নূতন পূর্ববঙ্গে স্যর ব্যাম্‌ফিল্‌ড ফুলারের শাসনও অপ্রতিহত তেজে চলিতেছিল ও নিত্য নূতন অত্যাচারের পন্থা অবলম্বন করিতেছিল।

১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল, ১৩১৩ সালের ১লা বৈশাখ বরিশালে এক কাণ্ডের অভিনয় হইল। এই ১৪ই এপ্রিল গুড্‌ ফ্রাইডে উপলক্ষে বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন স্থির হইল। বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন সাহেবের আদেশে বরিশালে প্রকাশ্যস্থলে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি নিষিদ্ধ হইল এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ প্রকাশ্যস্থলে "বন্দেমাতরম্‌" বলিবেন না—এই অঙ্গীকার করিয়া প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কলিকাতা হইতে অ্যান্টি সারকুলার সোসাইটির সভ্যগণ ও প্রতিনিধিগণ আসিয়া অভ্যর্থনা সমিতির এই হীন সর্তের সংবাদ পাইয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—তাঁহারা তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন না ও সর্বত্র মাতৃনাম শুনাইতে লাগিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশ মানিতে সম্মত ছিলেন না। যাহা হউক, সভাপতি আব্দুল রসুলকে লইয়া সভায় যাইবার পথে শোভাযাত্রার পশ্চাৎ ভাগ হইতে সোসাইটির যুবক ও স্বেচ্ছাসেবকদিগের উপরে পুলিশ আক্রমণ করিল—অমনি চারিদিক হইতে মাতৃনাম উচ্চারিত

অধিকার করেন। কিন্তু অশ্বারোহণে অপটুতাবশতঃ ইনি সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর ইনি কেম্ব্রিজে বৃত্তিলাভ করিয়া কিংস্ কলেজ হইতে ক্লাসিকাল ট্রাইপসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯২ সালে বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গায়কোয়াড়ের ইংলণ্ডে অবস্থানকালে অরবিন্দ তাঁহার সহিত পরিচিত হন ও তাঁহার অনুরোধে মাসিক ৭৫০৲ বেতনে বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। ইহার পর ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিয়া অরবিন্দ উক্ত আন্দোলনে যোগদান করেন ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। বাল্যাবধি বিলাতে প্রবাস হেতু তিনি আদৌ বাংলা বলিতে পারিতেন না।

একটি সম্পাদক সঙ্ঘদ্বারা 'বন্দেমাতরম্' পত্র সম্পাদিত হইত। অরবিন্দ ছিলেন ইহার প্রধান সম্পাদক এবং শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতিও ইহার সম্পাদক সঙ্ঘের অন্তর্ভূত ছিলেন। ইহার তেজপূর্ণ রচনায় অনতিবিলম্বেই ইহা গবর্ণমেণ্টের বিরাগ ভাজন হইয়া উঠিল এবং ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে লিখিত 'Politics for Indians' নামক প্রবন্ধ এবং ২৮শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত (Jugantar case) 'যুগান্তর' মোকদ্দমা শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য অরবিন্দ রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। এখন যেমন প্রত্যেক কাগজই সম্পাদকের নাম

মুদ্রিত করিতে বাধা, তখন এ নিয়ম ছিল না। সুতরাং অরবিন্দ যে এই পত্রের সম্পাদক ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষীরূপে আহ্বান করা হইল।

১৯০৭ খৃস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট তারিখে বিপিনচন্দ্র আদালতে উপস্থিত হইলে এবং তাঁহাকে আদালতের প্রথামত শপথ করিতে বলা হইলে, তিনি উত্তর করিলেন 'এই মোকদ্দমায় সাহায্য করিতে ও শপথ গ্রহণ করিতে বিবেকানুযায়ী আমার আপত্তি আছে।'

He (Mr. B.C. Paul) said : I have conscientious objections to swear or take any part in these proceedings.

The Court : Have you conscientious objections to be solemnly affirmed ?

Mr. B.C. Paul : I decline to take part in these proceedings, because I consider it—

The Court : I have nothing to do with that. Have you conscientious objections to be affirmed in any other case ?

Mr. B.C. Paul - No ; But I have conscientious objections to take part in this case.

The Court : You must take it in this case then.

Mr. B.C. Paul : I decline to do that.

The Court : Questions will be put to you and if you refuse to answer; then you must take the consequences.

Mr. B. C. Paul : On conscientious grounds I must refuse.

এ জবাব লইয়া আদালতে হাজির হওয়া নিতান্ত বাতুলতা ও দুঃসাহসিকতা। কিন্তু চিত্তরঞ্জন সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এরূপ সাহস দেখাইবার মত বাঙালী যে এখনও একজনও আছেন এই উল্লাসে তিনি আত্মহারা।

কোর্টে উপাধ্যায় নিজহস্তে বর্ণনাপত্র দাখিল করিলেন। তখন চিত্তরঞ্জন বলিলেন, উপাধ্যায় ত বর্ণনাপত্র দাখিল করিলেন, সুতরাং আমি দ্বিতীয় আসামী সারদার পক্ষ সমর্থন করিব।

৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। সন্ধ্যায় ৭ই আগস্ট তারিখে প্রকাশিত—"আমাদের পোয়াবারো, ফিরিঙ্গির তেরো", ৯ই তারিখে প্রকাশিত "আজ কালীঘাটে জোড়াপাঁটা একটা কালো একটা সাদা," ৩০শে আগস্ট তারিখে প্রকাশিত "ঢেঁকি অবতার", ৩রা সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত, "গোদা-পায়ের ভোঁতা লাথি" এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত "তুনো মজা, তিলে খাজা" রাজদ্রোহজনক বলিয়া এই মোকদ্দমার সৃষ্টি। চিত্তরঞ্জন সমস্ত দিন ধরিয়া প্রত্যহ জেরা করিতেন আর রাত্রে নিজ আবাসে ব্রহ্মবান্ধবের নিকট হইতে মোকদ্দমা সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। উপদেশ দিতে দিতে যেদিন বেশী রাত্রি হইয়া যাইত বা উপাধ্যায় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, সেদিন আর তিনি বাড়ী যাইতেন না,—চিত্তরঞ্জনের বাটীতে মেঝের উপর শুইয়া পড়িতেন। চিত্তরঞ্জনের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি বিছানায় শুইতেন না। ব্রহ্মবান্ধবের এই নিস্পৃহতা চিত্তরঞ্জন বিশেষ পছন্দ করিতেন।

এই সময় নিত্য নূতন রাজদ্রোহের মামলা হইত এবং প্রায় সর্বস্থলেই কিংস্‌ফোর্ড হইত বিচারক। কিন্তু এই সমস্ত মোকদ্দমায় কিংস্‌ফোর্ড সুনাম অর্জন করিতে পারে নাই। ৩রা অক্টোবর (১৯০৭) তারিখে কিংস্‌ফোর্ড টিফিনে গিয়াই অতি অল্প সময়েই চলিয়া আসিল। এই সংবাদ পাইয়া চিত্তরঞ্জনও বিস্মিত হইয়া অভুক্ত অবস্থায়ই চলিয়া আসিয়া মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন। বেলা ৫টার সময় চিত্তরঞ্জন কোর্টকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এখন উঠিবেন না ?"

Mr. Das : Does not your Honour propose to rise now ?

The Court : No, Mr. Das, I will be at you since till some time.

Mr. Das : I am sorry, I have been without food since 10 o'clock in the morning.

The Court : I think you must go on, Mr. Das.

Mr. Das : But then it is physically impossible Sir, I am feeling dizzy. I could not take anything during the half an hour, for which your Honour rose for lunch.

The Court : That is your look out, Mr. Das, you must go on.

Mr. Das : How can I go on ? Is not it absurd ?

The Court : It is absurd for counsel to talk about his food in the midst of a case. I can't hear all that I am not supposed to know, whether you took your food or not.

Mr. Das : May I know, how long your Honour would like to sit ?

The Court : I won't give you any indication. You must go on till I tell you to stop.

লাগিল। তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "আমি সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধেই লইয়াছি—তবুও ইহাকে লইয়া এত টানাটানি কেন?" ইহার পর হইতে তাহার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল—পরদিন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ পাইয়া তাঁহার প্রাণবায়ু পঞ্চভূতে মিলিত হইল। ধন্য ধন্য উপাধ্যায়! এ বুঝি তোমার ইচ্ছামৃত্যু—মৃত্যুবরণ করিয়া তুমি তোমার গর্ব সফল করিলে—মৃত্যুতে তুমি আরও উজ্জ্বল হইলে—এ বুঝি তোমার মৃত্যু নহে, এ তোমার বিজয়! ১৯০৭ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে গোয়েন্দা বিভাগ বাঙালী বিদ্রোহীদলের অস্তিত্বের সন্ধান পাইল। কিন্তু ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিশেষ কিছুই জানিতে পারিল না।

ছোটলাট সার এনড্রু ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেন ধ্বংস করিয়া দেওয়ার চেষ্টা বিপ্লবীদল দুইবার করিয়াছিল। ১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে চন্দননগরে প্রথম সে চেষ্টা হয়। শ্রীযুক্ত বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি সরকার এই কাজের জন্য চন্দননগর যান। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। ইহার পর নারায়ণগড়ে ছোটলাটের ট্রেন উড়াইবার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা হয়। সে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরের কথা। স্থান নির্বাচনের জন্য প্রথমে হরিশ ঘোষ ও শান্তি ঘোষকে পাঠান হয়। কিন্তু তাঁহারা ভালভাবে স্থান নির্বাচন করিতে পারেন নাই বলিয়া পরে প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি সরকারকে পাঠান হইল। ৬ই ডিসেম্বর রাত্রিতে নারায়ণগড় ও বেনাপুর স্টেশনের মধ্যে ছোটলাটের ট্রেন ধ্বংসের

গতি পরিবর্তন করিয়া পূর্বদিক দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হয়। এই বিপর্যয়ের পর হইতে করতোয়ার অবনতি আরম্ভ হয়। অমরকোষে ইহার অপর নাম সদানীরা বলা হইাছে এবং গঙ্গা যমুনার ন্যায় এই নদীও পুণ্যতোয়া বলিয়া গণ্য। স্কন্দপুরাণ, কালিকাপুরাণ, ও যোগিনীতন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে "করতোয়া মাহাত্ম্য" নামে স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। করতোয়ার অপর নাম সদানীরা নামে একটি নদীর উল্লেখ বেদের অনুগামী শতপথ ব্রাহ্মণেও দৃষ্ট হয়। স্কন্দপুরাণে করতোয়াকে "পৌণ্ড্রগণের প্লাবনকারিণী" বলা হইয়াছে। তাহাতে আরও বর্ণিত আছে যে হর-গৌরীর বিবাহকালে গিরিরাজ হিমালয়ের করভ্রষ্ট মন্ত্রপূত জল হইতে এই নদীর উৎপত্তি বলিয়া ইহার নাম "করতোয়া।" স্কন্দপুরাণের মতে বর্ষাকালে অপর সকল নদনদীই মলিনতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের পাবনীশক্তি আর থাকে না; সেই সময়ে একমাত্র করতোয়াই বিশুদ্ধ সলিল বহন করে এবং তাহার পবিত্রতা অক্ষুন্ন থাকে। পঞ্জিকাগুলিতে গঙ্গাস্নানের ন্যায় করতোয়া স্নানেরও বিভিন্ন যোগ উল্লিখিত থাকে। মহাভারতের বন-পর্বে লিখিত আছে যে করতোয়া স্নান করিয়া ত্রিরাত্রি উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের পৌণ্ড্রখণ্ড অনুসারে পৌষনারায়ণীযোগে বারাণসীতে পূজা করিলে ত্রিকোটি কুল উদ্ধার লাভ করে কিন্তু করতোয়া জলে পূজা করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল পাওয়া যায়। করতোয়ার

করেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে পৌণ্ড্রদেশবাসিগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষভুক্ত হইয়া পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল।

প্রাচীন মানচিত্রে মহাস্থান গড়ের নাম "মুস্তানগড়" রূপে লিখিত আছে। এই স্থানের "মহাস্থান" নাম হওয়া সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম তপস্যা করিবার জন্য একটি উপযুক্ত ও শাস্ত্রানুসারে চতুঃষষ্টি দোষ-বিবর্জিত স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরবর্তী এই স্থানটিকে আবিষ্কার করেন এবং এইস্থানে তপস্যাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহার "মহাস্থান" নাম দেন। স্মরণাতীত কাল হইতে মহাস্থান তীর্থরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। উত্তরকালে এইস্থানে পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইলে ইহা পুণ্ড্রনগর, পুণ্ড্রবর্ধন, পৌণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত হয়। পুণ্ড্রবর্ধন অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। বুদ্ধদেব পুণ্ড্রবর্ধনে আগমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মহাস্থানে আবিষ্কৃত মৌর্যযুগের একটি শিলালেখ হইতে জানা যায় যে খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্ধন মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহার শাসনকর্তা মহামাত্য নামে অভিহিত হইতেন। ৬৪০ খৃস্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাং কামরূপ হইতে পৌণ্ড্রবর্ধনে আগমন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে তৎকালে করতোয়া অতি বিস্তৃত নদী ছিল। তিনি ইহাকে ক-নো-তু

কিন্তু জাগরিত করিতে পারিল না। এই অপ্রফুল্ল সময়ে বরেন্দ্রভূমে প্রফুল্ল ভূমিষ্ঠ হইলেন। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে এই বরেন্দ্রভূমে আর এক প্রফুল্ল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তিনিই দেবী চৌধুরাণী ওরফে প্রফুল্লমুখী।

বিহার বা ভাসুবিহার প্রফুল্ল চাকীর পূর্ব পুরুষদিগের আদি বাসস্থান নয়। তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ প্রাণকৃষ্ণনারায়ণ চাকী পাবনা জেলার অন্তর্গত চাঁচকিয়া গ্রামে বাস করিতেন। প্রাণকৃষ্ণ চাকী উত্তর বঙ্গের এক বিশিষ্ট কায়স্থ বংশে খ্যাতনামা শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাণকৃষ্ণের একমাত্র পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ পিতৃ বিয়োগের পর বগুড়ার অন্তর্গত মাদলা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে; জ্যেষ্ঠ ইন্দ্রনারায়ণ, মধ্যম লক্ষ্মীনারায়ণ, ও কনিষ্ঠ চন্দ্রনারায়ণ। চন্দ্রনারায়ণ প্রফুল্লর পিতামহ। পিতৃবিয়োগের পর চন্দ্রনারায়ণ পৈত্রিক গ্রাম মাদলা পরিত্যাগ পূর্বক বিহার বা ভাসুবিহার গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এদেশের অনেকের আত্মমর্যাদাজ্ঞান এত কম এবং অনেকে এত অলস যে তাহারা আপন আপন চেষ্টায় জীবিকা উপার্জন না করিয়া জ্ঞাতি বা কুটুম্বের অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা হীনতা ও কাপুরুষতা আর নাই। পরান্নে প্রতিপালিত হইবার প্রবৃত্তি যাহাতে মনে না আসে সে বিষয়ে চন্দ্রনারায়ণ বিশেষ যত্নবান ছিলেন এবং আপনার চেষ্টা ও পরিশ্রমে আপনার জীবিকা উপার্জন করা তিনি কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সময় বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য বাংলার প্রাণকেন্দ্রে অন্তহীন জ্বালা ধরিয়াছে। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯০৫) গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইল যে ১৬ই অক্টোবর তারিখে পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। ক্রুদ্ধ বাঙালী পাল্টা জবাব দিয়া বলিল ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) হইতে আমাদের বন্ধন দৃঢ়তর হইল। সারাবঙ্গের নেতৃবৃন্দের উৎসাহে সারাবঙ্গ ব্যাপিয়া "রাখীবন্ধন"-এর মিলনোৎসব সম্পন্ন হইল। গবর্ণমেণ্টও এই অপমান নীরবে সহ্য করিলেন না। ১৭ই অক্টোবর তারিখে কোন কোন স্থলে ছাত্রগণ উপবাস করিয়া নগ্নপদে বিদ্যালয়ে গমন করিল। ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলে ও রংপুর স্কুলে এই অপরাধে বালকগণ দণ্ডিত হইল। ২২শে অক্টোবর তারিখে গবর্ণমেণ্ট কার্লাইল সারকুলার জারি করিলেন, তাহাতে স্কুলের ছাত্রগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ হইল। ইহার ফল কিন্তু শুভ হইল না—এই সারকুলারের প্রতিবাদ স্বরূপে অ্যান্টি সারকুলার সোসাইটি স্থাপিত হইল। ঐ দিন রংপুর জিলা স্কুলে প্রফুল্ল চাকী, পরেশ মৌলিক প্রমুখ কয়েকটি ছাত্র দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে প্রফুল্ল চাকী, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, সুরেশ চক্রবর্তী, নরেন্দ্র নাথ সেন, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, নরেন বক্সী, পরেশ মৌলিক প্রভৃতি ছাত্রগণ রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মধ্যপাড়ার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দেশকর্মী অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৫

পৈশাচিক লীলা দেখিতেছিলেন ; কিন্তু এবার তাঁহাদের ধৈর্যের বাঁধ অটুট রাখা শক্ত হইয়া উঠিল। বিভিন্ন বিপ্লব কেন্দ্রের বিপ্লবীদের অসন্তোষ বহ্নিতেও ইন্ধন সংযুক্ত হইল। অনতি-বিলম্বেই ইহার পরিচয় পাওয়া গেল। ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁহার এক বৈপ্লবিক সহকর্মীকে লইয়া রংপুর পৌঁছিলেন। সেই সময় তাঁহাদের অত্যন্ত টাকার প্রয়োজন হয়। রংপুর সহর হইতে ১২ মাইল দূরে একটি বাড়ীতে স্বদেশী ডাকাতি করার আয়োজন করা হইয়াছিল। ইহাই বাংলা দেশের সর্বপ্রথম স্বদেশী ডাকাতির প্রচেষ্টা। প্রফুল্ল চাকী এই ডাকাতির প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয় নাই।

ইহার পর ফুলার সাহেবকে অনুসরণ করা হয়। ফুলার সাহেবের ধুবড়ি হইয়া রংপুর আসিবার কথা ছিল। ধুবড়িতে বৈপ্লবিকদলের একজন কর্মীকে পাঠান হইয়াছিল এইজন্য যে লাটসাহেবের স্পেসাল ট্রেন ধুবড়ী ছাড়িয়া রংপুরের দিকে রওনা হইলেই তিনি রংপুরে টেলিগ্রাম করিয়া সে খবর দিবেন। এদিকে স্থির করিয়া রাখা হইয়াছিল যে রংপুরে স্টেশন হইতে মাইলখানেক দূরে একটা সুবিধামত জায়গায় লাইনের নিচে ব্যাটারী লাগাইয়া বোমা রাখিয়া আসা হইবে। কোনক্রমে যদি বোমা না ফাটে সেই আশঙ্কায় স্থির হইয়াছিল যে স্টেশনের বিপরীতদিকে প্রফুল্ল চাকী ও অপর একজন কর্মী রিভলবার

তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতম্॥
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটি ভীষণাননম্॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা॥
চণ্ডা চণ্ডাবতীচৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতাম্॥
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্।

ইহা দুর্গাপূজা নয়, কালীপূজা নয়, ইহা চামুণ্ডার পূজা—যে মূর্তিতে মা অসুর নাশ করেন, ইহা মায়ের সেই চামুণ্ডামূর্তি। এ মূর্তির ধারণা আমাদের আর হয়না—ভীষণতা যতদিন আমরা এমনই করিয়া আবার ভোগ করিতে না পারিব, ভীষণতায় যতদিন আবার এমনই করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতে না পারিব

পারেন। তিনি গুরুদেবকে (শ্রীঅরবিন্দকে) বলিলেন। উত্তর পাইলেন—ছেলেটি বোধ হয় রাজী হইবেন না। অতঃপর তিনি চারু দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া সবকথা বলিলেন ; কিন্তু ভাবে বোধ হইল তিনি ফল সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন ছেলেকে লেলে বা অন্যকেহ লইয়া যাইবে ইহাতে চারু দত্ত মহাশয় ঘোর আপত্তি করিলেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য তীব্র বাদানুবাদ হইল। লেলে যোগীজনের অনুচিত উত্তেজনার সহিত বলিলেন—এমন সুলক্ষণ ছেলেটিকে নষ্ট করিয়া কি লাভ ? ইহাকে আমার সহিত দাও ; ইহাকে পরম যোগী করিয়া দিব। ইহার মধ্যে কয়েকটি বিভূতির চিহ্ন বর্তমান।

এরূপ অন্ধকে চারু দত্ত মহাশয় কি বলিবেন ? তিনি উত্তর করিলেন—"আপনি মনে করেন শ্রেষ্ঠ ছেলেরা যোগাভ্যাস করিবে এবং নিকৃষ্ট ছেলেরা আমাদের কাছে আসিবে। অবশ্য ও যদি নিরাপদে থাকিবার জন্য আপনার সঙ্গে যাইতে চায়, যাইতে পারে, আমরা তাহাতে কোন আপত্তি করিব না।"

বারীন সেখানে উপস্থিত ছিল এবং বিরস মুখে সব শুনিতেছিল। চারু দত্ত মহাশয় তাহাকে প্রফুল্লকে ডাকিতে বলিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে প্রফুল্ল আসিল। গুরুদেব (শ্রীঅরবিন্দ) সব বুঝাইয়া বলিলেন। প্রফুল্ল সব কথাই স্থির হইয়া শুনিল এবং গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল "আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে

অন্যত্র কোথাও সরাইয়া না দিতে চান আমি কোথাও যাইতে চাহিনা।”

এখানেই এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি হইয়া গেল। ইহার পরে লেলে একাই বরোদায় ফিরিয়া গেলেন।

এখন হইতে প্রফুল্লর শক্তি ও বিপ্লব ধর্মকে আপনার মধ্যে একান্ত করিয়া তুলিবার বিচিত্র উদ্যম আমরা লক্ষ্য করিব।

১৯০৭-এর শরৎকালে কয়েক সপ্তাহের জন্য চারু দত্ত মহাশয় দার্জিলিংএ অবস্থান করিতেছিলেন। পরিপূর্ণ শরৎ। বাংলার ছোটলাট স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজারকে অনেকগুলি উৎসব ও সভাদির কার্যে যোগদান করিতে হইবে। একদিন না একদিন বিপ্লবীরা তাঁহাকে কোন না কোন খানে সুবিধায় পাইবেই। চারু দত্ত মহাশয় মোটামুটি সন্ধান লইয়া জানিয়াছিলেন যে তিনি স্টেশনের নিকটবর্তী গির্জায় প্রতি রবিবারের প্রভাত প্রার্থনায় যোগ দিয়া থাকেন এবং প্রথমে বড় ঘোড়ায় চড়িয়া অকল্যাণ্ড রোডের উপর দিয়া এবং পরে আঁকাবাঁকা পথ দিয়া নামিয়া আসেন; সঙ্গে একজন মাত্র দেহরক্ষী থাকে। বারীনের নিকট হইতে বোমা পূর্বেই আসিয়াছিল এবং প্রফুল্ল চাকীও পৌঁছিয়াছিল। চারু দত্ত মহাশয় প্রফুল্লকে সব বুঝাইয়া দিলেন। তাহাকে আঁকাবাঁকা পথের সম্মুখে শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং গভর্ণর যখন ঐ পথ দিয়া যাইবেন তখনই তাঁহার উপর উহা নিক্ষেপ করিতে হইবে।

প্রথম সে চেষ্টা হয়। বারীন্দ্র ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি সরকার চন্দননগর যান। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ইহার পর নারায়ণগড়ে ছোটলাটের ট্রেন উড়াইবার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা হয়। সে ১৯০৭ সনের ডিসেম্বরের কথা। স্থান নির্বাচনের জন্য প্রথমে হরিশ ঘোষ ও শান্তি ঘোষকে পাঠান হয়। কিন্তু তাঁহারা স্থান নির্বাচন ভাল ভাবে করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি সরকারকে পাঠান হইল। নারায়ণগড় ও বেনাপুর স্টেসনের মধ্যে একটা স্থান তাঁহারা মাইন বসাইবার জন্য ঠিক করেন এবং সেই স্থানের একটা নক্সা প্রস্তুত করিয়া লন। ৬ই ডিসেম্বর রাত্রিতে তাঁহাদের পূর্ব-নির্বাচিত স্থানে ছোটলাটের ট্রেন ধ্বংসের জন্য প্রায় একফুট গর্ত করিয়া বারীন ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি সরকার মাইন পুঁতিয়া রাখেন। সে মাইন ৬ পাউণ্ড ডিনামাইটে তৈয়ারী ছিল। ফিউজ রেল লাইনের উপরে রাখিয়া একটা সূতার সঙ্গে পাথরের ঢিল বাঁধিয়া দেওয়া হয় যেন হাওয়ায় উড়িয়া না যায়। বোমা ফাটিল, রেলও বাঁকিল কিন্তু গাড়ী উড়িল না। তবে ইঞ্জিনখানা জখম হইল এবং খড়্গপুর স্টেসন হইতে অপর একটা ইঞ্জিন লইয়া গিয়া লাটসাহাবের স্পেশালকে টানিয়া আনিতে হইল।

এই সময় ৩২নং মুরারীপুকুর রোডের আশে পাশে পুলিশের ঘোরাঘুরি বাড়িয়াছে দেখিয়া নাটোরের সতীশ সরকার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, বিভূতি সরকার ও

লাগিল এবং পতিত ও অনুর্বর ভূমির কর নির্ধারণ আরম্ভ করিল। ডিহিদারের অত্যাচারে প্রজাদের ছয় সাত পুরুষের অধ্যুষিত বাসভূমি পরিত্যাগ করিতে হইল। একদিকে জন্মভূমির চির উন্মাদ-করা স্মৃতি অন্যদিকে অভাবের নিষ্পেষণ তাহাদিগকে দুইদিক হইতে চাপিয়া ধরিল। দুঃখের মর্মান্তুদ ঘাত প্রতিঘাতে তাহাদের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ঠিক এই সময় এই স্বর্ণপ্রসূ রত্নগর্ভা শস্যশালিনী দেশের লোভে পাশ্চাত্যগণ ভিড় করিয়া আসিল তাহার নূতন আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া ভারতের উপকূলে।

"সদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্য বিপণির
একধারে নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিক লক্ষ্মী সুড়ঙ্গপথের
অন্ধকারে রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে।"

কিন্তু এই বণিক রাজদণ্ড করে লইয়াও বণিকবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারিল না। শাসনের পরিবর্তে ইহার দক্ষতা প্রকাশ পাইল শোষণে।

যে সকলস্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্যোৎপাদিত হয় সেই সকলস্থানে ইউরোপীয়দিগের একবার পদার্পণ ঘটিলে সেই

সকল দেশের অধিবাসিদিগের ধ্বংস সাধন অবশ্যম্ভাবী। তাই যে সকল দেশে একবার ইউরোপীয়দিগের শুভাগমন ঘটিয়াছে সেইসকল দেশে অশান্তির কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। এই কারণেই ইউরোপীয়দিগের পদার্পণ ঘটিবার অব্যবহিত পরেই আমেরিকার আদিম নিবাসী এবং অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসিগণ ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বুভুক্ষিত ইউরোপীয়দিগের উদর পূরণ করিতে গিয়া এক টাকায় আট মণ চাউলের দেশে এক টাকায় সাত সের চাউল বিক্রীত হইতে লাগিল। যে দেশে "সর্বদেবময়োতিথি" বলিয়া অতিথি অভ্যাগতদের পূজা হইত সেই দেশের একজন আত্মীয় অপর আত্মীয়ের বাটীতে গমন করিলে বিরক্তি অথবা অন্নব্যয়ের ভীতি জন্মিত। যে দেশের লোকে সাধারণত শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকিত, যে দেশের লোকের পরমায়ু ১২০ বৎসর সেই দেশের লক্ষ লক্ষ লোক পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যেই পরলোক গমন করিতে লাগিল। ঐইরূপ এক অপ্রসন্ন সময়ে ১৮৮৯ খৃঃ ৩রা ডিসেম্বর (১২৯৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে অগ্রহায়ণ) মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় মেদিনীপুর হবিবপুরে অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম বসু জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ত্রৈলোক্যনাথ বসু এবং মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। তাঁহার পৈত্রিক বাটী মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণভূম পরগণার অন্তর্গত মোহবনী গ্রামে। ত্রৈলোক্যনাথ বসু মেদিনীপুরের স্বনামখ্যাত রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁর এস্টেটের সদর কাছারীর তহশীলদার ছিলেন। তখনকার

লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী পরলোক গমন করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই ১৮৯৬ খৃঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী ক্ষুদিরামের পিতা ত্রৈলোক্য-নাথেরও মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পূর্বে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

পিতামাতার মৃত্যুর পর অবিনাশচন্দ্র বসু নামক ক্ষুদিরামের এক জ্ঞাতি খুল্লতাত ভাই ক্ষুদিরাম ও ভগ্নী ননীবালার লালন পালনের ভার লইয়াছিলেন এবং আনন্দপুর গ্রামে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। ননীবালার বিবাহ হইয়া যাইবার পর ক্ষুদিরাম নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিলেন। জীবনের প্রথম হইতেই তাঁহার দুঃখবেদনার সঙ্গে পরিচয় এবং পৃথিবীতে একাকী অবজ্ঞাত জীবন যাপনের জন্য প্রথম হইতেই তাঁহার উপর ভাগ্যের নির্দেশ আসিয়াছিল। যে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে তিনি বাস করিতেছিলেন সেখানে দেখিতে পাইলেন মমত্ববোধ ও সহানুভূতির অভাব। সুতরাং তথায় আর এক মুহূর্তের জন্যও অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। মনের এই অবস্থায় ক্ষুদিরাম একদিন গোপনে তথা হইতে একক পদব্রজে মেদিনীপুর শহরের দিকে যাত্রা করিলেন। আনন্দপুর হইতে মেদিনীপুরের দূরত্ব আট মাইলের কিছু অধিক। ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর শহরে পৌঁছিয়া তথায় হবিবপুর মহল্লায় কৃত্তিবাস বসুর বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রায় সপ্তাহকাল পর তাঁহাকে তমলুকে তাঁহার ভগিনীপতি অমৃতলাল রায়ের বাসভবনে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

গুপ্ত, অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত হইতে লাগিল। চেষ্টা বিফল হইল। তথাপি ক্ষুদিরামকে তাঁহার সুনাম রক্ষার্থ আর একটি সুযোগ দেওয়া স্থির হইল।

১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশাল কন্‌ফারেন্সে পুলিশের লাঠির ঘায়ে দেশ যজ্ঞ পণ্ড হইল। ইহার পর ১৯০৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্স হয়। সত্যেনবাবুর ইঙ্গিতে বালক ক্ষুদিরাম এই কনফারেন্সে কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে বিদ্রোহ-মূলক গুপ্তপুস্তিকা "সোনার বাংলা" ও "নো কম্প্রোমাইজ" (আপোষ চাইনা) বিতরণ করিতে গিয়া ধরা পড়ে। সত্যেন বাবুর চেষ্টায় ক্ষুদিরাম মুক্তিপায়। তখন সত্যেন কালেক্টরীতে একটি কেরানীগিরির চাকুরী করিতেন। এই ঘটনার কর্ণধার সন্দেহে ম্যাজিস্ট্রেট সত্যেনকে কড়া জেরা করেন। আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া নীরব থাকায় তাঁহার কেরানীগিরিটি খসিয়া যায়।

গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ১৯০৭ সালে ক্ষুদিরাম একবার হাটগাছায় গমন করিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় একটি ভীষণ গণ্ডগোলে চমকিত হইয়া গ্রামবাসী বাহির হইয়া দেখিল যে একজন ডাকহরকরা প্রহৃত হইয়া আর্তনাদ করিতেছে। কে যেন তাহার ডাক লুঠিয়া লইয়াছে। অপরূপা দেবী দেখিলেন যে ক্ষুদিরাম গৃহাভ্যন্তরে হাঁপাইতেছে। সেই রাত্রেই ক্ষুদিরাম বাহির হইলেন এবং বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুর অভিমুখে রওনা হইলেন।

বলিয়া প্রফুল্লকে জানাইয়া দেওয়া হয়। সাবধানতার জন্য এইরূপ করা হয়।

অতঃপর শ্রীবারীন ঘোষের উপদেশ ও আশীর্বাদ লইয়া মারণাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিপ্লবী ও বিপ্লবীগণতন্ত্রীদের হীন শত্রু কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য প্রফুল ও ক্ষুদিরাম মজঃফরপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

[redacted]

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিকানায় আনাইয়া লন। কিশোরীবাবুর আফিস ছিল ধর্মশালারই একটি কামরায়।

মুরারীপুকুর বাগান খানাতল্লাস করিবার সময় দীনেশচন্দ্র রায় ওরফে প্রফুল্ল চাকীর সুকুদার নিকট লিখিত একখানি পত্র পাওয়া যায়। এই পত্রে টাকা হারাইয়া যাওয়ার কথা ছিল এবং দীনেশ রায়ের ঠিকানা ছিল পূর্বোক্ত কিশোরী বাবুর আফিস। পত্রখানি আলিপুর বোমার মামলার সাক্ষ্যস্বরূপ উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। পত্রখানি এইরূপ :

"প্রিয় সুকুদা, আমরা নিরাপদে এখানে এসে পৌঁছেছি। পথে দুর্গাদাসের পকেট থেকে সমস্ত টাকা হারিয়ে গেছে। সেইজন্য আমরা মহা বিপদে পড়ে গিয়েছি। দয়া করে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ২০৲ টাকা পাঠাবেন। পরে আপনাকে সমস্ত জানাবো।"

এই সময় প্রফুল্ল মুরারীপুকুরে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষকে একখানি পত্রে জানান "সুকুদা, বর দেখিনি কিন্তু বরের বাড়ী দেখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে ভাল রসগোল্লা পাওয়া যায় না—কিছু ভাল রসগোল্লা পাঠাতে ভুলিবেন না।
—দীনেশ"

এই চিঠিতে লিখিত "বর" ও তাহার বাড়ীর প্রসঙ্গে আলিপুর বোমার মামলায় জজ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে বর কিংসফোর্ড ছাড়া আর কেহই নন।

একদিন দীনেশ কিশোরীবাবুর নিকট আসিয়া বলে যে পথে